অরূপের রাস

১

রাণুর সঙ্গে আমার ভাব ছিলো—

কিন্তু হঠাৎ একদিন আড়ি হইয়া গেলো।

রাণু ছোটো, আমিও ছোটো; সে সাত, আমি চৌদ্দো বছরের।··· বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেই শ্রেষ্ঠ হয় না, তথাপি বয়ঃকনিষ্ঠদের সম্বন্ধে বয়োজ্যেষ্ঠদের সহজ একটা দায়িত্ব বুঝি থাকেই, বিশেষত যদি প্রতিবেশী হয়।—

রাণুর সম্বন্ধেও আমার দায়িত্ব ছিলো···তার শারীরিক কোনো হানি না হয় ইত্যাদি।

তত্ত্বাবধায়কের পদগুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া মাঝে-মাঝে তাহাকে শাসন করিতেও যাইতাম; কিন্তু সে শাসনের ফলে তাহার সংশোধন কতদূর হইত তাহা নির্দেশ করিতে যাওয়া, তার রূপের ব্যাখ্যার মতোই নিষ্প্রয়োজন।

আমার গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া সে হাসিয়া আমার গায়ের উপর গড়াইয়া পড়িতো, বলিতো,—'কানুদা একটা বড়ো মানুষ কিনা, তাই বক্‌তে বসেছে।' হি, হি, হি।···

কিন্তু হতোদ্যম আমি কখনোই হই নাই।

রাণুর পিতা যদুগোপাল দত্ত মহাশয় অবস্থাপন্ন নহেন, নিঃস্বও নহেন! তাঁহার চাকরিতে উপরি পাওনাও ছিলো; এই পয়সাটা অধর্মের পয়সা—কিন্তু মাহিনার অল্প টাকাতেই সাংসারিক খরচটা কুলাইয়া ঐ অধর্মের পয়সার সবটাই জমিতো।

জন্ম, মৃত্য, পাশ, ফেল, আয়ের হ্রাসবৃদ্ধি, বিবাহ—এই রকমের সামান্য পারিবারিক পরিবর্তন ছাড়া গৃহস্থ বাঙালির ঘরে উল্লেখযোগ্য বড়ো কিছু ঘটে না; আমাদেরও ঘটে নাই। আমি একবার ফেল, একবার পাশ করিয়াছি, আর একবার কী করিবো তাহা দৈবের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছি; যদুগোপাল বাবুর চার টাকা বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং আর একটা বৃদ্ধি আসন্ন হইয়াছে।···

রাণুর বয়স দশ, আমার সতেরো।—

রাণু আমার পড়িবার ঘরে ঢুকিয়া আমার পাঠ্যপুস্তকের নেলসনের মৃত্যুদৃশ্যের উপর আঙুল রাখিয়া বলিলো,—এটা কিসের ছবি, কানুদা?

—যুদ্ধের ছবি। এই লোকটার বুকে গুলি লেগেছে, গুলি খেয়ে সে

মরছে।…বলিয়া ডান হাত দিয়া মরণোন্মুখ নেলসনকে দেখাইয়া দিলাম এবং বাঁ হাত দিয়া রাণুর কটি বেষ্টন করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলাম।

চট করিয়া একবার পিছন দিককার দরজার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রাণু নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া বলিলো,—আর কী কী ছবি আছে দেখাও।

রাণুর ঐ চট করিয়া দরজার দিকে চাহিবার অর্থটা আমার না বুঝিবার কথা নয়—

এবং অক্লেশে তাহা বুঝিয়া ফেলিয়া দশ বৎসরের বালিকার এই অকাল পরিপক্কতায় আমার বিস্ময়ের সীমা রহিলো না। কিন্তু আমার কী দুর্মতি ঘটিলো জানি না, সকৌতুকে হাসিয়া বলিলাম,—ঢের ছবি আছে; কিন্তু আগে তুই বল, তুই ছবি দেখতেই এসেছিস্ না আর কোনো মতলব আছে?

মনে হইলো, রাণু এই ঘুরানো কথাটার অর্থ ধরিতেই পারিবে না; তবু, পারে কিনা দেখিবার জন্য একটা উৎকণ্ঠাও জন্মিলো।

রাণু তৎক্ষণাৎ কথাটার উত্তর দিলো না—খানিক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া হঠাৎ চলিয়া যাইতে-যাইতে বলিলো,—এসেছিলাম তুমি রসগোল্লার হাঁড়ি নিয়ে ব'সে আছো তাই শুনে। ছবি দেখা মিছে কথা।

চেঁচাইয়া বলিলাম,—রসগোল্লা খেয়ে যা রাণু।

রাণুও তখন চিৎকার করিয়া বলিতেছিল,—রাধা, পুতুলের একটা বাক্‌শোর একটা টোপ শেলাই করবো, দুপুর বেলা একটিবার আসিস্, ভাই।…তাহার চিৎকারে আমার ডাক ডুবিয়া গেলো।

আমার উৎকণ্ঠার নিবৃত্তি হইল, কিন্তু পরাজয়ের একটা অব্যক্ত লাঞ্ছনায় আমি নিবিয়া একেবারে অন্ধকার হইয়া গেলাম।…ব্যাপারটা নিছক কৌতুক, কিন্তু হঠাৎ বিশ্রী হইয়া গেলো।

দুদিন পরে রাণু আসিয়া খবর দিলো—কানুদা আমার বিয়ে।

—বলিস্ কী?

—হ্যাঁ, সত্যিই। কাল দেখতে আসবে।

বিস্ময়ের কারণ এ সংবাদে কিছুই নাই। বিবাহরূপ পরিবর্তন বাঙালির জীবনে নিত্য ঘটিতেছে—কাহারো অল্প, কাহারো বেশি, কাহারো মধ্য বয়সে। রাণুর না হয় দশম বৎসরেই সেই সাধারণ পরিবর্তনটা ঘটিয়া যাইবে।

জিজ্ঞাসা করিলাম,—কোথায়?

—তা জানিনে। বাবা-মা ভারি ব্যস্ত। কতরকম খাবার তৈরি হচ্ছে। খেয়ে এলাম।

জিহ্বায় জল আসিলো—পুলকিত কণ্ঠে বলিলাম,—নিয়ে আয় কিছু, আমিও খাই।

—আনছি। বলিয়া রাণু চলিয়া গেলো।

আঁচলের আড়ালে লুকাইয়া একটা বাটি আনিয়া আমার সম্মুখে রাখিয়া ঠেলিয়া দিয়া রাণু কহিলো,—খাও।

আমি বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলাম।···সে মুখে বলিলো 'খাও', কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বরে আহ্বানের বাষ্পমাত্রও ছিলো না, বরং বিরুদ্ধ দিকেই যেন একটা ধাক্কা অনুভব করিলাম।···হঠাৎ এ রাগ কেন?

যখন সে যায় তখন তার মুখের দিকে চাহিয়া দেখি নাই; কিন্তু এখন লক্ষ করিলাম, রাণুর মুখাবয়বের প্রত্যেকটি রেখা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

রাণু বলিলো,—খাচ্ছো না যে?

কণ্ঠস্বর কর্কশ শুনাইল।

—তুই রাগ ক'রে দিলি কেন? রাগ ক'রে খাবার ঠেলে দিলে কেউ খেতে পারে?

রাণু উত্তর দিলো না।

একটু মুচকি হাসিয়া বলিলাম, চুরি ধরা প'ড়ে গেছে বুঝি?

—চুরি করিনি, চেয়ে এনেছি।

—তবে বামুনকে খেতে দিতে রাগ করলি কেন?

—রাগ কই করলাম? বললাম খাও।

আমি তাহার দিকে বাটিটা ঠেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

আমারও রাগ হইয়াছিল।···এতো ভুরু কোঁচকানো কিসের?···

উঠানে একটা কুকুর শুইয়াছিল—

রাণু দ্রুতপদে নামিয়া যাইয়া তাহারই সম্মুখে সেই দুধ, ক্ষীর, ছানা, সরের মিষ্টান্নগুলি বাটিশুদ্ধ উপুড় করিয়া ঢালিয়া দিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে বাড়ি চলিয়া গেলো।···

পূর্বে যে আড়ির কথা বলিয়াছি, এই ঘটনায় তাহার সূত্রপাত।—

রাণুর রূপ-গুণের পরীক্ষা হইবে—

দেখিতে গেলাম।···

প্রথমেই দৃষ্টি পড়িলো ধোঁয়ার আড়ালে লুকানো-মুখ একখানি দেহের উপর···

ধূমাকর্ষণের আর বিরাম নাই···নিরবচ্ছিন্ন ধূমপটল এক সময় সরিয়া যাইতেই দেখিলাম, কাঁচা-পাকা মোটাসোটা প্রৌঢ় একটি ভদ্রলোক হাত বাড়াইয়া রাণুর বাবার হাতে হুঁকা দিতেছেন !—

বারান্দায় একটা মাদুর বিছানো হইয়াছে ; তাহারই উপর রাণুর বাবা কন্যার পিতার মতো সবিনয়ে, বরের যে-ই হোন, তিনি বরপক্ষীয় কর্তাব্যক্তির মতো মাথা উঁচু করিয়া বসিয়া আছেন ; এবং আমারই বয়সী একটি ছোঁড়া অধোমুখে মাদুরের বয়ন-কৌশল প্রাণপণে নিরীক্ষণ করিয়াও দেখা শেষ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

বুঝিলাম, এটা দূত, পাত্রকে গোপনে কনের রূপের কথা শুনাইবে।—

পাত্রপক্ষীয় সেই কর্তাব্যক্তি বলিলেন,—মেয়ে পছন্দ হবেই। যেমন শুনেছি ঠিক তেমনটি যদি না-ও হয় তবু আপনার মেয়ে সুন্দরীই।

যদুগোপাল বাবু বলিলেন,—মায়ের আমার স্বাস্থ্যও খুব ভালো।

—হবেই তো, একটিমাত্র সন্তান ঐ মেয়েটি, খাইয়েছেন দাইয়েছেন ভালোই। দেশের মেয়েরা তো না খেতে পেয়েই আকারে ছোটো হ'য়ে যাচ্ছে। তাদের যে সন্তান হচ্ছে তারাও আকারে ছোটোই হচ্ছে। বলিয়া ভগ্নোদ্যমের মতো তিনিও যেন আকারে কিছু ছোটো হইয়া গেলেন।

যদুগোপাল বাবু নিঃসংশয়ে বলিলেন,—যে আজ্ঞে, তাতে কি আর সন্দেহ আছে ! আমার তো মনে হয়, ছোটো হ'তে-হ'তে একদিন বাঙালি ব'লে কোনো জাত পৃথিবীতে থাকবে না।···

আমার কিন্তু হাসি পাইতে লাগিলো—

কন্যাদায় বিপদ নিশ্চয়ই ; এই কনে দেখাদেখির ব্যাপারটা সমগ্র কন্যাদায়ের অংশ হইলেও, উদ্ধারটা প্রধানত উহারই উপর নির্ভর করে বলিয়া ঢের বেশি জাগ্রত।···উৎকণ্ঠায়-আশঙ্কায় বুক ঢিপঢিপ করিতে থাকে—কন্যার পিতা একবার কন্যার মুখাবলোকন এবং একবার পরীক্ষকের মুখাবলোকন করিয়া একবার দেখেন কন্যার শ্রী, একবার অন্বেষণ করেন পরীক্ষকের প্রীতি।···স্বর্ণপ্রতিমার সহিত যে-কন্যার রূপের উপমা চলে সেই কন্যার পিতার পরমাত্মাও এই সময়ে শুকাইয়া উঠিয়া দুলিতে থাকে ; অথচ জীবনের ট্রাজিডি এমনি উৎকট যে, ঠিক এই সময়টিতেই, মন যখন টাটায় তখন, মনের সশস্ত্র বিদ্রোহ দমন রাখিয়া তোশামোদকে বিনয়ের বেশে বাহির করিয়া বহু মিষ্টকথা উচ্চারণ করিতে হয়। ব্যাপারটা কষ্টের হইলেও ভিতরে-ভিতরে হাস্যকরই।—

সে যা-ই হোক, কর্তা বলিলেন,—'পুরুষদেরও সেই কথা। তারাও কি পেট ভ'রে খেতে পায় ভেবেছেন? হুঁ!'

যদুগোপাল বাবু পূর্বে এ-বিষয়ে কিছু ভাবিয়াছেন কিনা জানি না, কিন্তু বাঙালি পুরুষদের আধপেটা দুরবস্থার বার্তা কর্তার মুখে যেন হঠাৎ এই প্রথম পাইলেন এমনি বিস্ময়ে তাঁর চোখ খুব বড়ো হইয়া উঠিলো, বিষণ্ণ ভাবে বলিলেন,—'আজ্ঞে না, বিস্তর পুরুষ আছে যারা বারোমাসই একরকম—'

বোধহয় বলিতে যাইতেছিলেন, অনাহারে কাটায়।

কিন্তু কর্তা তাঁহাকে অগ্রসর হইতে দিলেন না, বলিলেন,—'বেলা বেড়ে যাচ্ছে, বেশি সাজগোজের দরকার নেই, বাড়িতে যেমন থাকে তেমনি আনতে বলুন।'

যদুগোপাল বাবু এবার বাঙালি পুরুষ সাধারণের দুরবস্থার সঙ্গে নিজের দুরবস্থা স্মরণ করিয়া আরও ম্রিয়মাণ হইয়া কহিলেন—'গরিবের ঘরের মেয়ে সাজগোজ কোথায় পাবো যে তাকে সাজাবো, বেয়াই!'—তারপর কণ্ঠস্বর উচ্চতর করিয়া বলিলেন,—'ঝি, হ'লো তোমাদের?'

ঘরের ভিতর হইতে উত্তর আসিলো —হয়েছে।

বেয়াই—ইনি তবে পাত্রের পিতা স্বয়ং।

একটু পরে ঝি হাত ধরিয়া রাণুকে চৌকাঠের ধারে আনিতেই সেইদিকে চাহিয়া আমার মুখ দিয়া সহসা বাহির হইয়া গেলো—বাঃ!

শাদা শেমিজের উপর লাল চওড়া পেড়ে একখানটা বাঁধা, কপালের উপর চুলের পাতা, পায়ে আল্‌তা, দুই ভ্রুর মাঝখানে ছোট্ট একটি কালো টিপ;—পরীক্ষা দেবার উপযোগী বেশ পারিপাট্য রাণুর মাত্র এইটুকু,—

কিন্তু এই নিতান্ত সাধারণ বেশেই রাণুর রূপ অসাধারণ নূতন মাধুর্যে মণ্ডিত হইয়া আমার চোখে পড়িয়া গেলো!

রাণুর মুখের উপর হইতে আমার চোখ ফিরাইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া যদুগোপাল বাবুর বেয়াই বলিলেন—'বাঃ-ই বটে।...এসো, মা, এসো, ব'সো।' বলিয়া সম্মুখস্থ খালি স্থানটিতে হাত রাখিলেন।

ধীরে-ধীরে নামিয়া আসিয়া রাণু তাঁহার সম্মুখে মাথা হেঁট করিয়া বসিলো; ঝি পাশের দিকে মুখ করিয়া তাহার গা ঘেঁষিয়া বসিলো।...

কিন্তু আমার বুকের ভিতরকার বাক্‌স্ফূর্তি যেন অকস্মাৎ অবরুদ্ধ হইয়া গেলো ...বহুদূরের কুজ্ঝটিকার আবরণ যেমন দেখায় তেমনি একটা অনির্দেশ্য অস্পষ্ট

ইচ্ছায় আমার মনের আকাশ ধীরে-ধীরে আবিল হইয়া উঠিতে লাগিলো।

হঠাৎ চমক ভাঙিয়া শুনিলাম, বেয়াই বলিতেছেন, আপনার মেয়ে সুলক্ষণা এবং সুন্দরী বটে; সচরাচর এমনটি চোখে পড়ে না। রূপের খ্যাতি যেমন শুনে এসেছিলাম তার শতগুণ বেশি রূপবতী আপনার মেয়ে···কানে শুনে এ-রূপ ধারণা করা যায় না। এ-মেয়ে আমি নেবো। বলিয়া রাণুর হাত দুখানি তুলিয়া ধরিলেন।

যদুগোপাল বাবু বলিলেন,—আপনার অগাধ দয়া।

—দয়া নয়, গরজ। আপনার মেয়ের অদৃষ্টে আমার ছেলে রাজা হবে।

যদুগোপাল বাবু হাসিলেন।

কিন্তু হাসিলেন বলিলে যেন ঠিক হয় না; বেয়াইয়ের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠের টানে তাঁহার প্রাণের আনন্দ ও গর্ব যেন এক ঝলক উছ্‌লিয়া পড়িলো।

আমিও মনে-মনে সর্বান্তঃকরণে কর্তার উক্তির সমর্থনই করিলাম। রাণুকে যে বিবাহ করিবে সে যে রাজ্যেশ্বরের মতোই ভাগ্যবান, এবং দুটি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সে যে রাজৈশ্বর্যই গৃহে লইয়া যাইবে তাহাতে কিছুমাত্র ভুল নাই।—

যদুগোপাল বাবু কিছুক্ষণ ইতস্তত এদিক-ওদিক করিয়া পণের কথাটা তুলিয়া ফেলিলেন; বলিলেন,—বড়ো দরিদ্র আমি, শুধু মেয়েটিকেই নিয়ে ব'সে আছি; তাকে কী দিয়ে বিদায় দেবো সে-সংস্থান—

যদুগোপাল বাবু যেন কত বড়ো একটা লজ্জাকর শ্রুতির অযোগ্য কথা কহিতে শুরু করিয়াছেন এমনি শশব্যস্তে বেয়াই জিব কাটিয়া বসিলেন; বলিলেন,—সর্বনাশ! অমন কথাও বলবেন না। স্বয়ং মা-লক্ষ্মীকে নিয়ে যাবো, তিনিই আমার ঘর ধনে-পুত্রে পূর্ণ ক'রে তুলবেন। আপনার দু-এক হাজারের ওপর আমার লোভ নেই।

শুনিয়া, কেন জানি না, আমারই চোখে জল আসিলো।

এই দুঃসহ সুসংবাদটা যদুগোপাল বাবুর একেবারেই অপ্রত্যাশিত।··· যদুগোপাল বাবু স্থিরদৃষ্টিতে মিনিটখানেক বেয়াই-এর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আচম্বিতে তাঁহার পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িলেন।—

বেয়াইয়ের এ-বিপদটাও সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

নিজের কথার ফলে এ-হেন সঙ্কটে পড়িতে হইবে জানিলে তিনি বিনাপণে রাজলক্ষ্মী ঘরে তুলিবার শুভ-ইচ্ছাটা মুখোমুখি না বলিয়া বোধ করি ডাকযোগেই জ্ঞাপন করিতেন।—মোটা মানুষ, তাহার উপর পায়ের উপর আস্তো একটা মানুষ উপুড় হইয়া পড়িয়া—সহসা পিছে হটা বা উঠিয়া দাঁড়ানো

বেয়াইয়ের সাধ্যাতীত; সে চেষ্টাও তিনি করিলেন না।···যদুগোপাল বাবুর দুই কাঁধ তিনি দুই হাতে ধরিয়া পায়ের উপর হইতে তাঁহাকে একরকম ঠেলিয়াই তুলিয়া দিলেন, অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন,—বেয়াই, এ কী কাণ্ড আপনি ক'রে বসলেন, মেয়ের সামনে আপনি আমাকে লজ্জা কেন দিলেন, চোখে আপনার জলই বা কেন?

—রাণুর মুখের দিকে চাহিলাম—

তার রাগ দেখিয়াছি, কান্না দেখিয়াছি, অবাধ্যতা দেখিয়াছি, চঞ্চলতা দেখিয়াছি—

কিন্তু লজ্জা দেখিলাম এই প্রথম—

রঙের এই লীলাপুলক।—

নিম্নের সকল বাষ্পাচ্ছন্নতা অস্পষ্টতার ঊর্ধ্বে সদ্যোত্থিত সূর্যের শোণিতাভা শৈলশীর্ষে যেমন—

তেমনি করিয়া রাণুর এই প্রথম লজ্জার রক্তরাগ আমার অন্তরায়তনের সর্বোচ্চ স্থানটি দীপ্ত করিয়া স্পর্শ করিয়া রহিলো।

···এ-কাণ্ড কেন করিলেন, মেয়ের সামনে বেয়াইকে কেন লজ্জা দিলেন, তার চোখেই বা জল কেন?···যদুগোপাল বাবু এ প্রশ্নত্রয়ের একটিরও উত্তর দিলেন না, বেয়াইয়ের ঠেলায় খাড়া হইয়া বসিয়া গাঢ়স্বরে বলিলেন,—আমার মেয়ের বড়ো সৌভাগ্য যে আপনার মতো মহাপুরুষের ঘরে সে যাবে। রাণু, তোমার শ্বশুরকে প্রণাম করো, মা।

রাণুর চোখের পক্ষ্মরাজির সূক্ষ্ম কৃষ্ণ রেখাটা শুধু দেখা যাইতেছিল—

এইবার সে চোখ তুলিয়া ভাবী শ্বশুরের মুখের দিকে চাহিলো; তারপর চোখ নামাইয়া হাত বাড়াইয়া অত্যন্ত ধীরে-ধীরে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলো। তিনি বিড়বিড় করিয়া অস্পষ্ট ভাষায় রাণুকে বোধহয় আশীর্বাদ করিলেন; এবং ঝিকে বলিলেন,—মাকে ঘরে নিয়ে যাও, দেখা শেষ হয়েছে।—

ঝি রাণুর হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গেলো।···তার পিঠের উপর এলানো চুল বাতাসে একবার দুলিয়া উঠিলো···পায়ের আলতার আভা চোখে পড়িলো··· একটা মিষ্ট গন্ধ নাকে গেলো।···

সবই বুঝিলাম, কেবল বুঝিলাম না ইহাই যে শুধু 'মিষ্টিমুখ' করিতে বসিয়া যদুগোপাল বাবুর বেয়াই এতো মিষ্টান্ন গহ্বরস্থ করিলেন কেন?—সেই দৃশ্যটাও গিলিলো অনেক।

বোধহয় বাপ-মায়ের আদেশেই রাণু বাড়ির বাহির হওয়া বন্ধ করিয়া দিয়া ছুল'ভদর্শন হইয়া উঠিলো। তা উঠুক···তিনমাস পরেই যে-মেয়ে শ্বশুরালয়ে যাইবে তাহার নৃত্যপরায়ণতা মানায় না।···

কিন্তু মাঝখান হইতে আমি তাহার চক্ষুশূল হইয়া উঠিলাম কেন!—অনেক ভাবিয়াও কারণটা ঠিক করিতে পারি নাই।···কথা বলা একদম বন্ধ করিয়া দিয়াছে; দেখা হইলে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়—যেন আমার সঙ্গে তার মুখচিনাচিনিও নাই।···একদিন দৈবাৎ তাহাকে হাতের কাছে পাইয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়াছিলাম; তাহাতে সে হঠাৎ এমনই গর্জন করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিলো যে, আমি সাত তাড়াতাড়ি তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া পলাইবার পথ পাই নাই।···

বাঙালির মেয়ে শিশুকাল হইতেই বিবাহের কথায় লজ্জা পায়—

বিবাহের পাত্র স্থির হইয়া গেলো, তা সে যতো ছোটো মেয়েই হোক না, কেমন ভারভারতিক ভাব ধারণ করে।·· আমি এখন রাণুর কাছে পরপুরুষ, রাণু তাই আমাকে লজ্জা করিতেছে; এবং সেদিনকার সেই মিষ্টান্নঘটিত ব্যাপারে অপমান বোধ করিয়া সে রাগ করিয়া আছে তাহা নহে।···লজ্জা রাগ এক কথা, বিরাগভরে পরিহার করা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা—একটিকে অন্যটি বলিয়া ভুল করা অসম্ভব।···রুষ্ট মুখে মিষ্টান্ন দিলে তাহা প্রত্যাহার করা ন-দশ বৎসরের বালিকার বিরুদ্ধে এতো বড়ো অপরাধ নহে যে তাহা সে ভুলিতেই পারে না।···যাহা হউক, রাণুকে একগুঁয়ে বলিয়া মনে-মনে গালি দিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম, সে আগে কথা না বলিলে আমিও যাচিয়া কথা বলিতে যাইবো না।—

বিনাপণে কন্যার বিবাহ—

যদুগোপাল বাবুর এতোখানি সৌভাগ্যের সংবাদে তাঁর আত্মীয় প্রতিবেশী শুভার্থীদের আহ্লাদে চোখ কপালে উঠিয়া যাওয়া ছাড়া তার আর একটি ফল হইলো ইহাই যে, যাঁহারা কন্যার পিতা তাঁহারা আশা করিতে লাগিলেন, দেশের হাওয়া ফিরিয়াছে—কন্যার বিবাহের পর তাঁহাদের আর কৌপীন ধারণ করিতে হইবে না।—

এই সময় রাণু একদিন আমার সঙ্গে যাচিয়াই কথা কহিলো।

—কানুদা, তুমি নাকি আমার বিয়েতে পদ্য লিখবে?

দুর্দৈব ঘটিবেই, কাজেই ঠিক মুহূর্তেই আমি প্রীতি-উপহারকে আরও উপদেশপূর্ণ করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে কয়েকটা লাইন কাটিয়া পরিবর্তে নূতন

লাইন যোজনা করিতেছিলাম।

কাগজের উপর চোখ রাখিয়াই বলিলাম, —শু।

—কী লিখেছো পড়ো দেখি শুনি।

একটু গর্বিত ভাবেই পড়িলাম।—

সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, স্বদেশ, শ্বশুর, শাশুড়ি, স্বামী প্রভৃতি গুরুজন ; দেবর, ননদ, দাস-দাসী, সমগ্র মানবজাতি এবং গৃহপালিত পশু-পক্ষীর প্রতি নারীর কর্তব্য কিছুই আমার পদ্যে বাদ পড়ে নাই ; অপরিচিত ও বিপৎসঙ্কুল সংসার-কাননে প্রবেশোদ্যত নবদম্পতির মস্তকে করুণা ও আশীর্বাদ বর্ষণ করিতে ভগবানকে সানুনয়ে আহ্বান করিয়া প্রীতি-উপহার শেষ করিয়াছি।—

পড়া শেষ করিয়া কাগজখানি পরম মমতার সহিত টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিতেছি—এমন সময় রাণু ছোঁ মারিয়া কাগজখানা টানিয়া লইয়া বোঁ করিয়া বাহির হইয়া গেলো।···চেঁচাইতে-চেঁচাইতে প্রীতি-উপহারের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া যখন রাণুদের বড়িতে ঢুকিলাম তখন রাণু রান্নাঘর হইতে বাহির হইতেছে।

হাঁকিয়া বলিলাম,—আমার কাগজ দে।

রাণু আঙুল তুলিয়া রান্নাঘরের ভিতরটা দেখাইয়া দিয়া সরিয়া গেলো।—

রাণুর মা রান্নাঘরের ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কীরে, কানু ?

আমি বলিলাম,—আমি উপহার লিখেছিলাম ; রাণু নিয়ে পালিয়ে এসেছে।

—ওমা, তাই বুঝি জ্বলন্ত উনুনে দিয়ে গেলো। এমন হতভাগা মেয়েও তো জন্মে দেখিনি।—

ক্রন্দন দমন করিতে-করিতে চলিয়া আসিলাম ; দুর্জয় ক্রোধে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিলো !—প্রীতি-উপহার নিজের নাম সংবলিত করিয়া ছাপাইয়া বিতরণ করিতে পারিলাম না বলিয়া আমার আদৌ দুঃখ হইলো না ; ক্ষোভে-দুঃখে আমার অসহ্য বোধ হইতে লাগিলো ইহাই যে, এতো শ্রম এতো চিন্তার ফল রচনাটিকে নিষ্প্রয়োজনে সে এমন নৃশংসভাবে নষ্ট করিয়া ফেলিলো !···সাত দিনের দিন পদ্যটি খাড়া করিয়াছিলাম,—কতো কাটিয়া কতো ছাঁটিয়া কতোবার নকল করিয়া তবে তাহাকে মনের মতো করিয়া তুলিয়াছিলাম···ভাবিতে-ভাবিতে কতোবার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে—দিনে দুশোবার পড়িয়াও তৃপ্তি হয় নাই,—সেই পদ্য কিনা আগুনে দিয়া পুড়াইল !·· নিজের মাথা হইতে শব্দ বাহির করিয়া ছন্দ মিলাইয়া পদ্য লেখা এই আমার প্রথম—আমার আদিতম মানস-তনয়াকে লইয়া সে এ কী করিলো ! তাহাকে জ্বলন্ত উনানে ঠেলিয়া দিয়া পুড়াইল !··· শোকাগুনে আমি পুড়িতে লাগিলাম।—

রোশনচৌকি বাজিতেছে—

আজ রাণুর বিবাহ।

সেদিন রাণুর সঙ্গে রাজৈশ্বর্যের উপমাটা দৈবাৎ মনে আসিয়াছিল।···

আজ সেইটাই যেন খচখচ করিয়া কোথায় বিঁধিতে লাগিলো—একটা আপশোশের মতো।—

রাণু ঘোমটা টানিয়া শ্বশুরবাড়ি গেলো; আমি বাক্‌শো-বিছানা বাঁধিয়া কলিকাতায় পড়িতে আসিলাম।—

রাণু পিত্রালয়ে আসে, আমিও বাড়ি আসি।···

কিন্তু বলিবার মতো কিছু ঘটে না।···

যেদিন ঘটিলো, সেদিন অপূর্ব অননুভূতপূর্ব একটা অসামান্য অনুভূতির অতিশয় বেগবান হিল্লোলে আমি সহসা পূর্ণ হইয়া গেলাম—শুষ্ক নদী যেমন বন্যার জলে দেখিতে-দেখিতে পূর্ণ হইয়া যায়।···সুপ্তোত্থিত স-বসন্ত রতিপতি কখন আসিয়া উঁকি দিতে আরম্ভ করিয়াছিল টের পাই নাই—

সহসা সে সিংহদ্বার খুলিয়া আসিয়া দাঁড়াইল—

এবং সেই মুহূর্তেই আমার উল্লসিত চোখের সম্মুখে জলস্থল অন্তরীক্ষে একটা লোহিত মায়াঞ্জন ব্যাপ্ত হইয়া গেলো।···

রাণু আমাকে দেখিতে পায় নাই—

আমিই তাহার জ্বলন্ত রূপ আর দুরন্ত যৌবনের দিকে চাহিয়াছিলাম,—নেত্রের সেই উন্মত্ত সম্ভোগ জীবনের প্রতিদিনের বস্তু নয়, চোখের পলক পড়িতে চাহে নাই।···

ঘটনা আমাদের বাড়িতেই—

যখন দৈবাৎ এক সময়ে তাহার সঙ্গে আমার দৃষ্টির মিলন হইয়া গেলো, তখনই রাণু লাল হইয়া উঠিয়া শশব্যস্তে স্থান ত্যাগ করিয়া গেলো।—অন্তরের তৃষ্ণার্ত কলুষ অগ্নি-তরঙ্গের মতো আমার বুক জুড়িয়া গড়াইয়া বেড়াইতে লাগিলো।—

রাণুর বয়স এখন চৌদ্দো—

কিন্তু অতুলনীয় প্রচুর স্বাস্থ্যের প্রভাবে সে ঐ বয়সেই কৈশোর উত্তীর্ণ হইয়া পূর্ণ-যৌবনের মধ্যাহ্নে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।—

দুদিন পরেই রাণুর সঙ্গে দুই বাড়ির যাতায়াতের পথে দেখা হইলো। আমাকে দূর হইতে দেখিয়াই সে থমকিয়া দাঁড়াইল···

যেন ফিরিয়া যাইবে—

কিন্তু তার বদলে সে আঁচল তুলিয়া মুখ আড়াল করিয়া পথ ছাড়িয়া সরিয়া

দাঁড়াইল !—

পাশ দিয়া যাইতে-যাইতে মুখে বলিলাম,—আমি কানু।

কিন্তু মনের ভিতর যে কাণ্ড চলিতে লাগিলো তাহার মূর্তি ঝটিকাহত সিন্ধুর মতো—

রাণু বলিলো,—তা জানি। তুমি আমার মুখ দেখবার যোগ্য নও। বলিয়া সে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া গেলো।

ঘটনার সূত্র ধরিয়া কথার অর্থ ঠিকই বুঝিলাম, কিন্তু বিদ্ধ হইয়া অভিমান করিতে পারিলাম না। তাহাকে নূতন চক্ষে দেখিয়া অবধি বুকে যে ঝড় উঠিয়াছিল, ক্রোধ-অভিমানের সাধ্যই ছিলো না তার মধ্যে মাথা তোলে !··

অন্তরলোকের জ্যোতির্মঞ্চের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, নিঃসঙ্গ দুটি গ্রহের মতো সে আর আমি।

এতো খবর রাণু জানে না।—

রাণু স্বামীর ঘরে গেলো।

·· কিছুদিন পরেই হঠাৎ একদিন মৃত্যু ক্ষুধিত রাক্ষসের মূর্তিতে দেখা দিয়া নর-নারীগুলিকে যেন দুই হাতে মুখে তুলিয়া অবিরাম গ্রাস করিতে লাগিলো।·· ক্রন্দনে-হরিধ্বনিতে আকাশ পূর্ণ হইয়া গেলো···শববাহকের মুখে হরিধ্বনি, পীড়িতের শয্যাপার্শ্বে হরিধ্বনি, দলবদ্ধ লোকের মুখে হরিধ্বনি·· কিন্তু হরিঠাকুর ভয়ার্ত জীবিতের আকুল আহ্বানে কর্ণপাতও করিলেন না—

লোক মরিতেই লাগিলো।

মহামারী আরম্ভ হইবার সপ্তম দিনে রাণুর পিতা ও মাতা মাত্র বারো ঘণ্টার ব্যবধানে কালগ্রাসে পতিত হইলেন।—

রাণুকে দুঃসংবাদটা দিয়া আমরা দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিলাম।

* * *

দেশে ফিরিয়া আসিয়াছি।

ছয়মাসে শ্মশান আবার লোকালয়ের আকার ধারণ করিয়াছে।

বাবা রাণুকে তাহাদের ঘর-বাড়ির একটা ব্যবস্থা করিবার জন্ত পত্র লিখিলেন।

রাণু লিখিলো, বাড়ি বেচিয়া ফেলুন।

সেইদিন আমিও একখানা পত্র পাইলাম, দেখিয়াই চিনিলাম, ঠিকানা লেখা রাণুর।—লিখিয়াছে—

কানুদা, তোমার সঙ্গে জীবনে আর দেখা হইবে না, জীবনে ইহাই আমার সকল দুঃখের বড়ো দুঃখ।

দুটি দিনের কথা তোমার মনে পড়ে?···যেদিন রাগ করিয়া দিয়াছিলাম বলিয়া খাবার খাও নাই, আর যেদিন তোমার প্রীতি-উপহারের কাগজ আগুনে ফেলিয়া দিয়াছিলাম? কারণ কী, তুমি নিশ্চয়ই জানো না। শুধু এইটুকু জানিয়া রাখো, তোমার সে-উল্লাস আমার সহ্য হয় নাই।—তুমি ব্রাহ্মণ, আমি শূদ্রাণী; আমার প্রণাম গ্রহণ করো। ইতি—রাণু।

২

রাণুর পত্র পড়িয়া শূন্যের দিকে চাহিয়া আমার দৃষ্টি নিষ্পলক হইয়া গিয়াছিল—

অবাক মন দিশা পায় নাই। কিন্তু অদৃষ্টে ছিলো রাণুর সঙ্গে আবার দেখা হইবে।

রাণুর স্বামী বদলি হইয়া আমাদের দেশে রাণুরই হস্তান্তরিত বাড়িতে ভাড়াটে হইয়া আসিলো।

রাণু প্রথমটা কান্নাকাটি করিয়া আমার স্ত্রীর সখিত্বে সুস্থির হইলে দেখিলাম, রাণু ইন্দিরাকে একান্ত সন্নিকটে টানিয়া হইয়া আমাকে তার রাজ্য হইতে একেবারে নির্বাসিত করিয়া দিয়াছে।

আশা করিয়াছিলাম, অন্ততপক্ষে কানুদা বলিয়া ডাক দিয়া রাণু আমার পায়ের ধুলা লইয়া যাইবে; কিন্তু আসিলো না।

ইন্দিরা বলিলো,—রাণুর ছেলেটি বড়ো সুন্দর হয়েছে।

—হবারই তো কথা; ওরা দুজনেই সুন্দর।

—ছেলেটাকে আমায় দেবে বলেছে।

ইন্দিরার পক্ষ হইতে ছেলে চাওয়া অস্বাভাবিক নয়। জিজ্ঞাসা করিলাম, চেয়েছিলে বুঝি?

—না, না, চাইবো কেন! সে-ই বললে, বউ আমার ছেলেটা তুই নে।

—বেশ দয়ালু তো!

হঠাৎ ইন্দিরা লাল হইয়া উঠিলো। তাহার এই চমৎকার লজ্জা দেখিয়াই মনে পড়িয়া গেলো, আমার শেষ কথাটার অর্থ বহুদূর যায়।···পুত্রবতী হইবার আশা একেবারে ত্যাগ করিয়া না বসিলে রাণুর দানে দয়ার কথাটা আসে না।···কিন্তু ইন্দিরার বয়স সবে পনেরো।

জিজ্ঞাসা করিলাম,—ছেলের নাম কি?

—বেণু।

মনে-মনে আবৃত্তি করিলাম, কানু···বেণু। কেন জানি না, ছেলের নাম বেণু রাখা, এবং ব্যাপার বেনামিতে নিষ্পন্ন করিয়া তাহাকে আমার ক্রোড়ে অর্পণ করিবার অসত্য প্রস্তাবের একটা গভীর নিহিত অর্থ ও অভিসন্ধি যেন ধীরে-ধীরে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিলো।

হয়তো আমার কল্পনা অমূলক—

হয়তো চিন্তা ও ইচ্ছা পরস্পর অবিচ্ছেদ্য—

কিন্তু ভ্রান্তির মাঝে জন্মলাভ করিয়াই হর্ষের যে-কম্পন প্রাণের উপর দিয়া শিরশির করিয়া বহিয়া গেলো তাহা পরম তৃপ্তির সঙ্গেই উপভোগ করিলাম; সীমা লঙ্ঘন করিয়া যাইতে কোথাও টান পড়িলো না।—

বেণুর মুখের দিকে চাহিয়া ইন্দিরা বলিলো, দুটি দাঁত উঠেছে মুক্তোর মতো। নেবে কোলে?

—দাও। বলিয়া হাত বাড়াইতেই বেণু নির্বিবাদে আমার কোলে আসিলো।

ইন্দিরা হাসিয়া বলিলো,—বেশ আলাপী।

কথাটা কানে গেলো, কিন্তু মন তখন অন্যদিকে ছুটিয়া চলিয়াছে·· তাহারই অঙ্গবিচ্যুত এই শিশু—

তাহারই সুনিবিড় আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির এই বিগ্রহ—

তাহারই প্রাণের স্পন্দন দেহের বিন্দু বিন্দু ক্ষরিত রক্ত, হৃদয়ের আনন্দ-রস স্থানান্তরিত হইয়া আমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আছে।···

মুখ তুলিয়া দেখিলাম, ইন্দিরা বেণুর দিকে অত্যন্ত লালসার চক্ষে চাহিয়া আছে, আমি চোখ তুলিতেই ইন্দিরা একটু হাসিয়া সরিয়া গেলো,—আমারও চক্ষে লালসা ছিলো, কিন্তু দুটিতে এমনি অমিল যেন হাসি আর কান্না।

বেণুর চোখের দিকে চাহিলাম···

ঠিক তেমনি চক্ষু দুটি; কোথায় প্রভেদ কোথায় নয়, মিল অমিলের কোথায় সন্ধিস্থল সে-বিশ্লেষণ নিমেষেই অতিক্রম করিয়া আমার দৃষ্টি সেই দৃষ্টির নীল পারাবারে ডুবিয়া গেলো।

···সহসা মনে হইলো, আমি যেন অপূর্ণ; জীবনের অর্ধাংশ বিচ্ছিন্ন কক্ষচ্যুত হইয়া আমাকে স্বতন্ত্র করিয়া দিয়াছে···সর্বত্রই ঐক্য, শান্তি; কেবল কী হইলে কী হইতো ইহারই একটা অস্থির উত্তপ্ত কল্পনা আমার একটা দিক যেমন শুষ্ক বেদনাময় করিয়া তুলিয়াছে, অন্য দিকে একটা দুরু দুরু শঙ্কারও শেষ নাই—পাছে এই বেদনা অসাড় হইয়া একদিন মনে নিরাশার লোল স্থবিরত্ব আসিয়া যায়!···

ইন্দিরা আসিয়া অস্থির হইয়া গেলো—ছেলে কোলে করার রকম ঐ নাকি?

বেণুকে তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলাম,—রকম দুরন্ত হ'য়ে আসবে; যতোদিন তা না হয় ততোদিন পরের ছেলে একটু অসুবিধা ভোগ করলোই বা।

একটা ধমক খাইলাম।—

…আমার অন্তর্গূঢ় সুখের শত্রু হইয়া উঠিলো, ঈর্ষা। থাকিয়া-থাকিয়া বুক টনটন করিয়া চোখের সম্মুখে ফুটিয়া ওঠে, আমার নিজেরই বিবাহিত জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া একটা ছবি—

রাণু পরস্ত্রী—

…এই জ্ঞানটা অনায়াস মুখ-সমাদরের সঙ্গে মনে-মনে লালন করিবার বস্তু নয়—

অনিবার্য অঙ্কুশ-তাড়না যেন ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতে চায়।

ইন্দিরা একটা নূতন খবর দিলো,—রাণুটা একটা পাগল!

—মানে?

—বলে, আয় বৌ, তুই আর আমি এক হ'য়ে যাই।

—পাগলের লক্ষণই বটে। তুমি কী বললে?

জিজ্ঞাসা করিলাম, ইন্দিরা কী একটা উত্তরও দিলো—

কিন্তু ইন্দিরা তখন তাহার শব্দ-স্পর্শ লইয়া আমার সম্মুখ হইতে একেবারে মুছিয়া গেছে…

সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চের কণ্টকোৎসব জাগাইয়া আনন্দের সুতীব্র শিখা আমার স্নায়ু-শিরায় প্রজ্বলিত লইয়া উঠিয়াছে।…

কতক্ষণ এই উদ্বেলিত আনন্দে মুহ্যমান হইয়াছিলাম, কী করিয়াছিলাম জানি না।—হুঁশ ফিরিলে দেখিলাম ইন্দিরা অবাক হইয়া আমার দিকে চাহিয়া আছে।…একটু হাসির আমদানি করিয়া বলিলাম,—কী বলছিলাম যেন?

ইন্দিরা বলিলো,—তুমি কিছু বলছিলে না, আমিই বলছিলাম যে — বলিয়া হঠাৎ থামিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ইন্দিরার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম,—উঠলে যে? হঠাৎ রাগ হ'লো কিসে?

—রাগ হয়নি, কিন্তু তোমার মতো অন্যমনস্ক লোকের সঙ্গে কথা বলাই বালাই।

—আচ্ছা, এবারকার মতো মাপ করো।…রাণু পাগলের মতো কী কথা কয়েছে, তুমি তাতে কী বললে?

ইন্দিরা সমগ্র ব্যাপারটা কী ভাবে গ্রহণ করিলো সে-ই জানে, সহজ কণ্ঠেই বলিলো, 'আমি বললাম, পারো হও। কিন্তু একজনকে তাহ'লে বৌ খোয়াতে হবে।'—রাণু বললে, 'কানুদাকে জিগগেশ করিস সে খোয়াতে রাজি আছে কিনা।'

—'মোটেই না।' বলিয়া ইন্দিরাকে আলিঙ্গন করিতে হাত উঠি-উঠি করিয়াই থামিয়া গেলো। বলিলাম, 'বসন্তবাবুর সঙ্গে একটা আপোশ ক'রে নিতে পারলে একরকম বন্দোবস্ত করা যায়। '

কিন্তু হঠাৎ ইন্দিরার উৎসাহ যেন নিবিয়া গেলো।

ছ-মাস কাটিয়াছে।

টেলিগ্রামে বসন্তবাবুর বদলির খবর আসিয়াছে।

রাণুর সঙ্গে এতোদিন মুখোমুখি দেখা হয় নাই। আমাদের বাড়িতে সে আসে নাই।

ইন্দিরাকে বলিয়াছে, 'বড়ো ঝামেলা, ভাই, গল্প জমে না।' ইন্দিরাকে সে ডাকিয়া লইয়াছে।

যাইবার আগের দিন রাণু আমাদের বাড়িতে আসিলো।···ছেলেটিকে ইন্দিরার কোলে দিয়া আমার পায়ের কাছে একটা প্রণাম রাখিয়া কহিলো,—'কানুদা কাল আমরা যাবো। তোমার বৌ আজ রাত্তিরে আমার কাছে শোবে। বৌটি বড়ো ভালো মানুষ।'

আমি বলিলাম,—'ভালমানুষ বৈ কি।' বলিয়া রাণুর দিকে চাহিয়া হাসিবো কি ইন্দিরার দিকে চাহিয়া হাসিবো তাহা স্থির করিতে না পারিয়া আইনের পুস্তকের দিকে চাহিয়াই একটু হাসিলাম।···

—'রাজি তো?'

নিজেরই চমকানো দেখিয়া বুঝিলাম অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিলাম।

—'কিসে?'

ইন্দিরা বলিলো—'ঐ রকমই, কথায়-কথায় অন্যমনস্ক।'

রাণু বলিলো,— 'ঐ যে বললাম, বৌ রাত্তিরে আমার আছে শোবে। আর তো দেখা হবে না।···'

কণ্ঠস্বর গাঢ় শুনাইল।

বলিলাম, — 'আচ্ছা।'

ইন্দিরা বলিলো,— 'যা বলেছি ঠিক তাই।'

— 'কী?'

— 'রাণুটা একটা পাগল।'

— 'আবার কী বললে?'

ইন্দিরা খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, — 'কে জানতো···'

বলিয়া থামিয়া খুব হাসিতে লাগিলো।

আমি নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ইন্দিরার হাসি থামিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, — 'কথাটা কী?'

ইন্দিরা বলিলো, — 'যেন স্বামী আর স্ত্রী, সে আর আমি।'

একটা দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া গেলাম। —

ইন্দিরার অঙ্গ হইতে আমার স্পর্শ মুছিয়া লইয়া সে ত্বক্ রক্ত পূর্ণ করিয়া লইয়া গেছে!···আমি তৃপ্ত।

———

শঙ্কিতা অভয়া

মেয়ে শান্তিময়ীর জন্য জননী অভয়ার মানসিক চাঞ্চল্যের এক মুহূর্ত বিরাম নাই, আর, চাঞ্চল্য এতো যে তার অন্ত নাই—তার সেই উদ্বেগ আর ভীতি এতো প্রবল আর অসহ্য যে সময়-সময় বিভ্রান্ত অস্থির চিত্তে সে আত্মহত্যায় নিষ্কৃতি লাভের কল্পনা করে — দিবারাত্র মেয়ের অশুভ পরিণাম চিন্তা করিয়া করিয়া তারই বিষে তার শরীর ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে—

শান্তির বয়স সতেরো, অতিশয় সুশ্রী মেয়ে; শরীরের গঠন-নিবিড়তা এমন পূর্ণাঙ্গ চমৎকার সুস্থ যে, অভয়ার মনে হয়, তার তুলনা নাই; কিন্তু মনে হয় না যে, স্বচ্ছন্দ চিত্তে তাকে নিরীক্ষণ কি আশীর্বাদ করা যায় — তার রূপ আর দোষের কথা মনে হইয়া অভয়ার শরীর আতঙ্কে শিহরিত হইতে থাকে —

সর্বাপেক্ষা মুগ্ধকর তার চক্ষুদুটি—মেয়ের চক্ষু ঠিক মায়ের অতীত দিনের চক্ষুর মতো—গাঢ়তম বর্ণে তা গভীর, কিন্তু গম্ভীর নয়, হাসিতে ভরা, ভারী অস্থির; মনে হয়, গভীরতার ভিতরে এমন চঞ্চল একটা স্রোত বহিতেছে যার লক্ষ্য নাই, ইষ্টকর গন্তব্য ক্ষেত্র নাই, প্রতি মুহূর্তে যার গতি পরিবর্তিত হইতেছে—

অভয়ার অত্যন্ত ভয় এখানেই —

তার মনে হয়, মেয়ে যেন কেবলই ভাবে, কাজের বেলায় লঘু-গুরু ন্যায়-